স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীজির ধারনা।

ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরার পথে ১৯০৯-এর ১৩ থেকে ২২ নভেম্বর— মাত্র দশ দিনে গান্ধি গুজরাটি ভাষায় লেখেন 'হিন্দ স্বরাজ' নামক গ্রন্থটি, পরের বছর নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে তা প্রকাশ করেন 'Hind Swaraj or Indian Home Rule' নামে। সংস্কাররাচ্ছন্ন বৈষ্ণব পরিবারের প্রাত্যহিক বিচারহীন হিন্দু আচার— গুজরাটের জৈন ঐতিহ্য— বাইবেলের খ্রিস্টিয় পাপবোধ— রাসকিন (Unto This Last)-এর সরল ও সমবেত জীবনের আদর্শ— থরো (On the Duty of Civil Disobedience)-র অসহযোগ এবং টলস্টয় (The Kingdom of God Is within You)-এর খ্রিস্টিয় অহিংসা ও দারিদ্র্যব্রত চিন্তার জগাখিচুড়ি করে গান্ধি নিজে তাঁর রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে ভবিষ্যতের ভারতকে চিত্রিত করেন এই গ্রন্থে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে ১৯০৯ সালে যে গান্ধি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের 'বিশ্বস্ত' প্রজা; দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সমানাধিকার পাওয়ার আশায় যিনি ভারতীয়দের আর্যজাতির বংশধর বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না; সারা জীবন যাঁর রাজনৈতিক প্রচারের অন্যতম সহায় হয় রেলপথ; প্রেস এবং টেলিগ্রাফের ব্যবহার যিনি যথেচ্ছ করেন; যিনি নিজে এবং তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীদের অধিকাংশই ছিলেন আইনজীবী; সেই একই ব্যক্তি হঠাৎ ব্রিটিশ শাসন তথা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তুলোধোনা করলেন কেন? আসলে আধুনিক সভ্যতাকে এই গ্রন্থে চরম আক্রমণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক জীবনকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহের ক্রমাগত ব্যর্থতায় হতাশ গান্ধি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের সময় সমাগত। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের চরমপন্থীরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বর্জন করার যে সঙ্কল্প ও চরম অবস্থান নিয়েছিলেন, এই পুস্তকে তার থেকেও এক চরমতম অবস্থান নিয়ে দেখাতে চাইলেন তিনি তাঁদের চেয়েও বেশি র‍্যাডিক্যাল এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

গান্ধির 'হিন্দ স্বরাজ'-এর মূল কথাই হল সামগ্রিকভাবে আধুনিক সভ্যতা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় শিল্পব্যবস্থার বিকল্পের সন্ধান দিলেন দেশীয় চরকার প্রসঙ্গ তুলে। শুধু প্রসঙ্গ তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের এই চরকা কাটার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের কথাও বললেও তিনি। যদিও তিনি এই চরকা সম্পর্কে লিখছেন, "১৯০৯ সালে আমি যখন লন্ডন শহরে তখনই চরকা আবিষ্কার করলাম। ... কিন্তু আমি তখন তাঁত এবং চরকার মধ্যে পার্থক্যটা জানতাম না এবং 'হিন্দ স্বরাজ'-এ চরকা বোঝাতে তাঁত শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম" পরেও বলেছেন, "এমনকি আমি যখন 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে

চরকাকে ভারতের বর্ধমান দারিদ্রের মহৌষধ বলে লিখলাম তখনও আমি তাঁত বা চরকা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমনকি যখন ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরলাম তখনও বাস্তবক্ষেত্রে কোনও চরকা আমি দেখিনি।”

যাই হোক, ভারতবর্ষে এসে চম্পারণ-আমেদাবাদ-খেড়া-রাওলাট সত্যাগ্রহ পর্বের শেষে গান্ধি ক্রমশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। ততদিনে তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোখলে প্রয়াত হয়েছেন, মারা গেছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তিলকও। এই সন্ধিক্ষণে গান্ধি দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগের ডাক দিলেন আর তাঁর প্রধান অস্ত্র হল বিলিতি পণ্য বিশেষত বস্ত্র ‘বয়কট’ এবং অন্যদিকে গঠনমূলক কর্মসূচি হিসেবে ‘স্বদেশি’। এই স্বদেশিরই প্রধানতম রূপ হিসাবে তিনি স্থান দিলেন চরকাকে। আমরা জানি যে অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, স্বরাজও এক বছরের মধ্যে আসেনি; তবুও চরকার মাহাত্ম্য প্রচারে দমলেন না গান্ধি।

‘স্বরাজ’কে তিনি ‘হোম রুল’ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলছেন ‘অনেকেই চায় ইংরেজদের বাদ দিয়ে ইংরেজি শাসন’। তারা ভারতকে ইংল্যান্ডের মডেলে পরিণত করতে উৎসুক। অর্থাৎ ইংরেজ না থাকলেও তাদের নীতি থেকে যাবে। একে তিনি স্বরাজ বলতে নারাজ ছিলেন।

দ্বিতীয়ত তিনি বলতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ অহিংসা। এই অহিংসা শুধুই হিংসাকে প্রতিরোধ করা নয়, এখানে তিনি বলছেন অহিংসা খুব ‘counterproductive’ এবং অহিংসা নীতির কোনও বিকল্প হতে পারেনা। শত্রুকে পরাস্ত করারও সেটা খুব বড় অস্ত্র। পুরো ‘হিন্দ স্বরাজ’ জুড়ে এই অহিংসা নীতির কথা রয়েছে।

তৃতীয়ত, গান্ধী স্বদেশী নীতি প্রবর্তনের ডাক দিচ্ছেন। এই স্বদেশী প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হল ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সমস্ত রকম বাণিজ্য বন্ধ করা। এখানে তিনি অর্থনৈতিক নির্ভরতার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। ইংরেজ বাণিজ্যের মাধ্যমেই ভারতে আসে এবং ঔপনিবেশিক শক্তি প্রণয়নের এক বিশেষ ক্ষেত্র হল বাণিজ্য। তাই বাণিজ্যকেই বাদ দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন তিনি।
পরিশেষে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার কড়া সমালোচনা করে বলেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পরিপন্থী। এই বিষয়টি অবশ্যই জোরদার তর্কের দাবি রাখে। কিন্তু এখানে এটাও ভাবতে হবে ‘হিন্দ স্বরাজ’ লেখার সময়ে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পৃথিবী ব্যাপী এক প্রভাবের নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে তিনি সচেতন করতে চেয়েছিলেন। শুধু ভারতে নয়, দক্ষিণ অ্যাফ্রিকাতেও তিনি দেখেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির ক্ষমতায়ন যার প্রকট রূপ বর্ণ বিদ্বেষ।

ভারতীয় সভ্যতার যে আত্মিক সম্পদ তা যে ঔপনিবেশিক শক্তি নষ্ট করে দেবে, যার ছাপ তখন স্পষ্ট ভারতের মানুষের ইংরেজি অনুকরণে সে ব্যাপারে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

‘স্বরাজ’ শব্দটা কিন্তু প্রথম রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করেছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬- ১৯২০)। তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলমন্ত্রই ছিল ‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। আমাকে তা পেতে হবে’। দুজনের কাছে ‘স্বরাজ’ অর্থাৎ স্বশাসন হলেও, গান্ধীর মতে ছিল ইংরেজদের ক্ষমতার প্রতিস্থাপন কিছু পরিবর্তন করতে পারবেনা । তিনি একদম মৌলিক জায়গায় প্রশ্নটা নিয়ে গিয়েছিলেন ‘আত্ম’ বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি আর ‘শাসন’ বলতেই বা কি বুঝি এবং দুজনের পারস্পারিক সম্পর্ক কিসের ভিত্তিতে প্রকাশ পাবে? আজ শতবর্ষেরও বেশ কিছু বছর বাদে ‘হিন্দ স্বরাজ’ বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শক্তির পরাজয়ের কয়েক দশক বাদে, নব্য উপনিবেশবাদ বা বিশ্বায়ণের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ‘হিন্দ স্বরাজ’ মূল আলোচনার এক আধুনিক বিষয় হতে পারে। ‘স্বরাজ’ র মূল প্রশ্নের তিনি এক পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছিলেন। ভারত শাসনের অধিকার কার, এই রাজনৈতিক সমস্যা থেকে প্রশ্নটা অনেক গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন নৈতিক আধিপত্যের দিকে।

আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলে উনি এক অসাধারণ স্থানান্তরণ করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তি ও তার আত্মরূপকে এক অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে। একজন মানুষের অধিকারের বাইরে, একজন প্রজার তার সাম্রাজ্যের বাইরে, একজন নাগরিকের তার জাতির বাইরে, ভারতের রূপ দেওয়া। যেখানে একজন ব্যক্তি ও ভারতের কোনো ভেদ থাকছেনা। ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব ও ভারতের সার্বভৌম হওয়া এক বিন্দুতে মিলে যাচ্ছে। গান্ধী এভাবে ভারতের অন্বেষণের সঙ্গে নিজের অন্বেষণকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

আত্মকে কেন্দ্রে রেখে গান্ধী তার যুক্তিকে ভারতীয় মার্গীয় দর্শনের সামনে দাঁড় করান। ভারতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের লাগাতার সাফল্যে গত ছয় দশকে আমরা গান্ধীর এই আত্মানুসন্ধান নিঃশেষ হতে দেখেছি এবং ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব গুলো যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, তখন ‘স্বরাজ’ সম্পর্কে গান্ধীর সাবধানবাণী আমাদের এখন যথেষ্ট ভাবায়।

অহিংসার প্রশ্নেও গান্ধীর বক্তব্য ছিল নীতির প্রশ্নে যখন বিদ্রোহের জন্ম নেয়, তখন কোনোরকম সশস্ত্রনীতি সেই নৈতিক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। সেই জন্যেই ক্রান্তি, আজাদি বা জিহাদি সঙ্গত ভাবে কখনো স্বরাজের মূল লক্ষ হতে পারেনা। দার্শনিক আকীল বিলগ্রামীর মতে, ‘হিন্দ স্বরাজ’ এ অহিংসার ওপর গান্ধীর ভূমিকাটি ঔপনিবেশিক ভারতের সব রকমের ঔপনিবেশিক আন্দোলনের থেকে স্বতন্ত্রতা দাবী করে। ভারত অনেককাল স্বাধীন তাই স্বরাজও এখন গুরুত্ব হারিয়েছে, কিন্তু আত্ম ও সার্বভৌমের এই পারস্পারিক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা এখনও চলছে।

নিজের করা তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের শিকিভাগও তিনি বাস্তবে তার নিজের আন্দোলনে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। তাঁর নিজের আদর্শের থেকে তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা ছাড়িয়ে মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। এখানেই হয়ত তাঁর চরম ব্যর্থতা

কিন্তু তা বলে তাঁর তাত্ত্বিক অন্বেষণে কোনোভাবে খর্ব করে না, বরং নূতন করে আলোচনার উপাদান জোগায়। স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে গত সাত দশকে নানা অসাম্য ও বৈষম্য প্রতিরোধী সংগ্রামে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতবাদী আন্দোলনে গান্ধীর স্বরাজ ভাবনার মৌলিক আত্মানুসন্ধান খুব বেশীরকম ভাবেই প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র ঃ-

গান্ধী হিন্দ স্বরাজ ও নূতন কিছু ভাবনা-- অভিষেক রায়